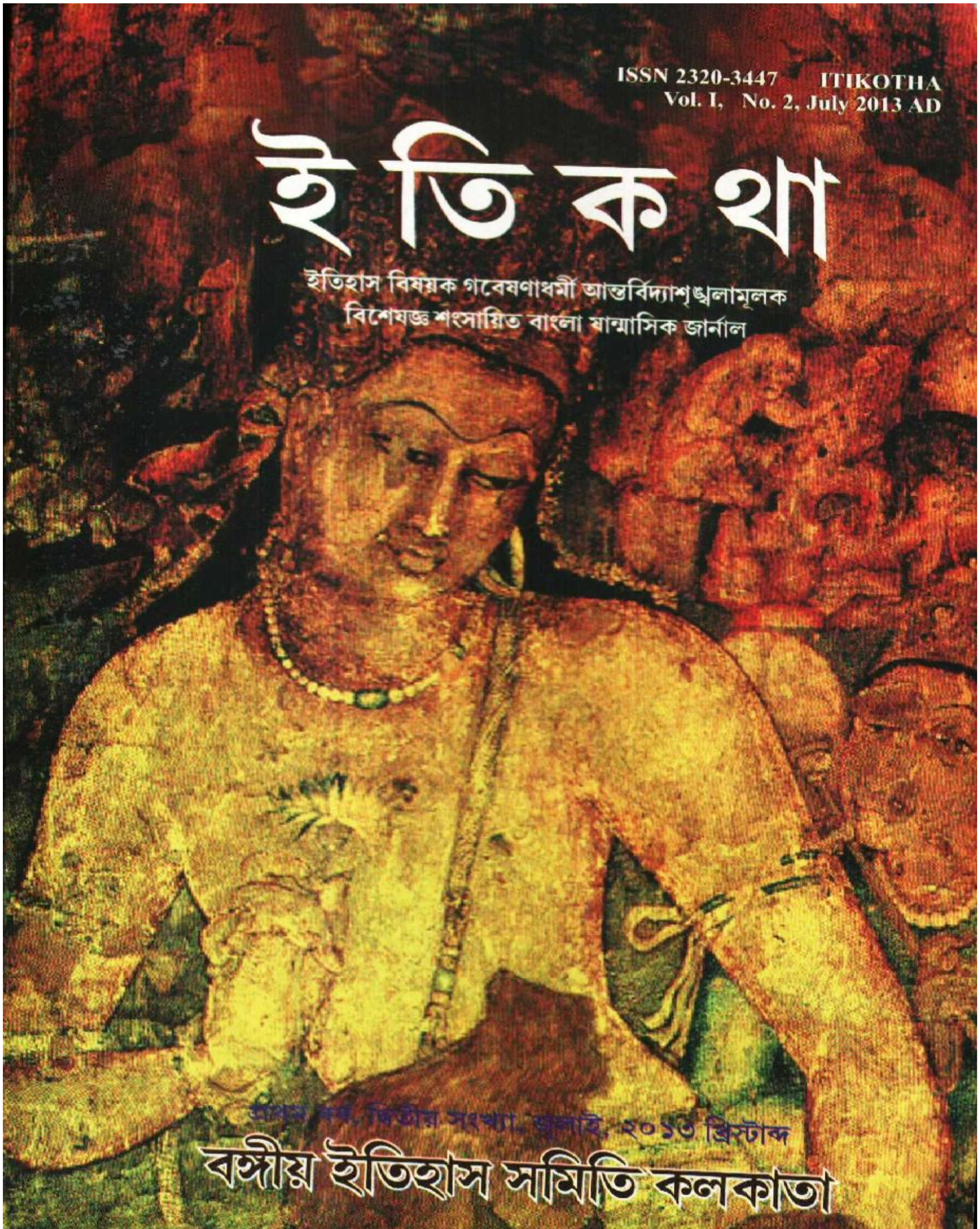
ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. I, No. 2, July 2013 AD
ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষান্মাসিক জার্নাল
দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. I, No. 2, July 2013 AD

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা যান্মাসিক জার্নাল

প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)
প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর
ড. সুচন্দ্রা ঘোষ
প্রফেসর অমিত দে

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ই তি ক থা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষান্মাসিক পত্রিকা
ISSN 2320-3447 Itikotha (Print)
Vol. I, No. 2, July 2013 AD

সম্পাদকীয় ৭

স্মরণালেখ্য

ইতিহাস চর্চার অসামান্য কারিগর : হব্‌সবম ৯
সিদ্ধার্থ গুহরায়

অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪
সুনন্দা ঘোষ

ইতিহাসবিদ ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধায় ১৮
কল্যাণসৌরভ জানা

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বরুণ দে চলে গেলেন ২৮
অনিরুদ্ধ রায়

প্রবন্ধ

আমাদের পূর্বসূরী ইতিহাস-সাধক: বেণীমাধব বড়ুয়া ৩৪
গৌতম নিয়োগী

রাজধর্ম ও লোকধর্ম একটি স্থানীয় সমীক্ষা ৪৩
অন্নপূর্ণা রায়চৌধুরী (কুমার)

মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম মানসে
হজরত আবুবকর সিদ্দিকির ভাবমূর্তি ৫৪
শংকরকুমার বিশ্বাস

গোস্বামিনী জাহ্নবা : নারী-ক্ষমতায়নের ‘শুকতারা’ ৮৫
সনৎকুমার নস্কর

অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতির রূপরেখা :
একটি বিতর্ক ৯৯
বিনয়ভূষণ চৌধুরী

দার্শনিক তথা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও 'গোরা' ১১০
মৃগাঙ্ক মুখোপাধ্যায়

গোয়েন্দা নথিতে ১৯০৮ সালের মেদিনীপুর
বোমা মামলায় নাড়াজোল রাজ ১২৬
মঙ্গলকুমার নায়ক

ইতিহাসের আলোয় চা-বাগানের নামকরণ : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ ১৩৯
সুপম বিশ্বাস

দেশ-বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার বিদ্যালয়ের ইতিহাস
পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গ : শিক্ষানীতি বনাম রাজনীতি ১৫৭
রতনলাল চক্রবর্তী

গ্রন্থ সমালোচনা

মধ্যযুগের ভারতে প্রশাসন ও তার রূপ ১৭৬
সৌমিত্র শ্রীমানী

ইতিহাস চর্চার অসামান্য কারিগর : হব্‌সবম

(৯ জুন ১৯১৭খ্রি. - ১ অক্টোবর ২০১২ খ্রি.)

সিদ্ধার্থ গুহরায়*

(প্রাপ্ত ১ জুলাই ২০১৩খ্রি.)

২০১২ সালের ১ অক্টোবর একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক এরিক হব্‌সবম ইতিহাস চর্চার মায়া কাটিয়ে চলে গেলেন। কেবল ইতিহাস নয়, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি ও রাজনীতির ছাত্রছাত্রীদের কাছেও তাঁর মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর তথ্যানুসন্ধানের একাগ্রতা, তথ্য বিশ্লেষণের সুনিপুণ দক্ষতা, অসামান্য পাণ্ডিত্য ও অনবদ্য সাহিত্যিক উৎকর্ষ বিগত ছয় দশক ধরে ইতিহাস চর্চাকে সমৃদ্ধ করেছে। হব্‌সবমের গবেষণার পরিধি ছিল বিশাল এবং ইতিহাস-চর্চার বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র জুড়ে তাঁর বিচরণ। ফরাসি বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব, শ্রমিক শ্রেণির ইতিহাস, প্রান্তিক মানুষের সংগ্রাম, রুশ বিপ্লব, বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদ, নাৎসিবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে তিনি গবেষণা করেছেন। এমনকি সাম্প্রতিক কালের অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি, যেমন বিশ্বায়ন ও সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত তাঁর নজর এড়ায়নি। অষ্টাদশ শতকের অন্তিম লগ্ন থেকে সমকালীন ঘটনাবলি—সমস্ত কিছুর প্রতি তাঁর প্রবল উৎসুক্য ছিল। এমনকি সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে উত্তরণ সংক্রান্ত বিতর্কেও তাঁর অংশগ্রহণ সাবলীল।[১] তিনি কেবল মাত্র একজন ঐতিহাসিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন নিপুণ রাজনৈতিক বিশ্লেষক। মার্কসবাদের প্রতি অবিচল আস্থা তিনি তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত ধরে রেখেছিলেন। তথাপি হিউ ট্রেভোর-রোপারের মতো মার্কসবাদ বিরোধী ঐতিহাসিক তাঁকে 'Very accomplished historian' হিসাবে আখ্যায়িত করতে কুণ্ঠিত হননি।

১৯১৭ সালের ৯ জুন এরিক হব্‌সবম মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। একজন কমিউনিস্টের পক্ষে সালটা গুরুত্বপূর্ণ। আর সাম্রাজ্যের ইতিহাসবিদদের কাছে সালটি তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর পূর্বপুরুষেরা ছিলেন পোল্যান্ডের অধিবাসী। সেদিক থেকে হব্‌সবম ছিলেন দ্বিতীয় প্রজন্মের ব্রিটিশ। তাঁর পিতামহ ছিলেন একজন পোলিশ ইহুদি। ১৮৭০ সালে তিনি লন্ডনে আসেন। এরিকের পিতা লিওপোল্ড লন্ডনে জন্মগ্রহণ করে জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব লাভ করেন। এরিক হব্‌সবমের শৈশব কেটেছিল অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায়। অত্যন্ত অল্প বয়সে পিতামাতাকে হারিয়ে মাত্র ১৪ বছর বয়সে এরিক তাঁর এক কাকার কাছে জার্মানির বার্লিনে চলে আসেন। তখন জার্মানিতে হ্বাইমার প্রজাতন্ত্রের শাসনের অন্তিম লগ্ন।

---

*অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিবেকানন্দ কলেজ, ঠাকুরপুকুর।
e-mail : bisk707@gmail.com

অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

(১ জানুয়ারি ১৯৩৩খ্রি.—৪ এপ্রিল ২০১৩খ্রি.)

সুচন্দ্রা ঘোষ*

(প্রাপ্ত ১৭ জুন ২০১৩খ্রি.)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন কারমাইকেল অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণ ভারত ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে এক ইন্দ্রপতন। মুদ্রাতত্ত্ব ও লেখমালাচর্চায় তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। গবেষণা জীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক অধ্যাপক সরসীকুমার সরস্বতীর সান্নিধ্যেই তাঁর গবেষণার সূচনা হয়। প্রাচীন ইতিহাসের উপাদান ও ভাষা সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান ছিল অসামান্য। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভাষাবিদ্ স্যর হ্যারল্ড বেইলির কাছে তিনি ব্যাকট্রিয়ান, সোগডিয়ান এবং অ্যারামাইক ভাষা শিক্ষা করেন। লণ্ডনে থাকাকালীন তিনি অধ্যাপক ম্যারি বয়েসের কাছে শেখেন পার্সিয়ান। রাধাগোবিন্দ বসাকের কাছে তিনি প্রাকৃত শিক্ষা করেন এবং সংস্কৃতে গভীরতর জ্ঞান অর্জন করেন। এই ভাষাজ্ঞান তাঁকে বহু প্রকার লেখপ্রাপ্ত তথ্যপাঠে সাহায্য করে— যা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুনর্গঠনে অপরিহার্য। বলা বাহুল্য যে, তিনি শুধুমাত্র লেখবিদ্ বা মুদ্রাতাত্ত্বিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ঐতিহাসিক। পঞ্চাশটির বেশি গ্রন্থ ও প্রায় আটশত'র মত গবেষণা প্রবন্ধ তাঁর সুবিশাল জ্ঞানের পরিচায়ক।

ঐতিহাসিক হিসাবে ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন তথ্যপ্রাপ্তির উপরই ইতিহাসচর্চা নির্ভরশীল, যদিও তথ্যসূত্রকে সমালোচনার উর্ধ্বে স্থান দিতে তিনি কখনই রাজি ছিলেন না। ১৯৬০-এর দশকে তিনি লন্ডনের 'স্কুল অব্ ওরিয়েন্টাল এন্ড আফ্রিকান স্টাডিজ' থেকে তাঁর নিম্ন সিন্ধু অঞ্চল (আনুমানিক ১ খ্রি.—১৫০ খ্রি.) শীর্ষক গবেষণার জন্য পি-এইচ. ডি. ডিগ্রি লাভ করেন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক এ. এল. ব্যাসাম-এর কাছে তিনি গবেষণা করেন, যিনি রোমিলা থাপার, রামশরণ শর্মার মত খ্যাতনামা ঐতিহাসিকেরও গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণাপত্রের আকার দেখে প্রখ্যাত অধ্যাপক রেমণ্ড অলচিন মন্তব্য করেছিলেন, 'An extra large thesis from an extra large man.' তিনি একজন বড় মনের মানুষও ছিলেন। ১৯৬৩ সালে লন্ডন থেকে ফিরে আসার পর তিনি সংস্কৃত কলেজের স্নাতকোত্তর বৃত্তিমূলক পাঠক্রম ও গবেষণা বিভাগে ভারততত্ত্বের সাম্মানিক অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হন। কিছুকালের মধ্যেই তিনি তাঁর মৌলিক গবেষণার স্বীকৃতি পেতে শুরু করেন। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত তাঁর *ননা অন লায়ন - এ স্টাডি ইন্ কুষাণ নুমিস্মেটিক আর্ট* শীর্ষক গ্রন্থটি নতুন ধরনের গবেষণার দিগন্ত উন্মোচনের জন্য উচ্চপ্রশংসিত

*অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : suchandra64@gmail.com

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক বরুণ দে চলে গেলেন

(জন্ম : ২৬ অক্টোবর ১৯৩২খ্রি., মৃত্যু : ১৬ জুলাই ২০১৩খ্রি.)

অনিরুদ্ধ রায়*

(প্রাপ্ত : ১০ অক্টোবর ২০১৩খ্রি.)

বরুণ দে'র বাবা ও ঠাকুরদা ছিলেন অ-সামরিক শাসনকর্তা। ঠাকুরদা ব্রজেন্দ্রনাথ দে ছিলেন ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের (আই. সি. এস.) সদস্য। তিনি ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। নিজামুদ্দিনের *তবাকৎ-ই-আকবরী* ইংরেজিতে অনুবাদ করেন, যেটি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয়। বরুণ দে'র বাবা বসন্তকুমার দে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনি যখন আদরাতে নিযুক্ত ছিলেন তখন বরুণ দে'র জন্ম হয়। বরুণ দে'র বাল্য বয়স ওই সব অঞ্চলে কেটেছে। কিছুকাল পরে বসন্তকুমার দে কলকাতায় বদলী হলে বরুণ দে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ভর্তি হন। ওখান থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বরুণ দে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। ইন্টার মিডিয়েট পাশ করে ওই কলেজেরই ইতিহাস বিভাগে অনার্স নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। তখন ইতিহাস বিভাগের প্রধান শিক্ষক ছিলেন সুশোভনচন্দ্র সরকার। ওই বিভাগে পড়াতেন শশীভূষণ চৌধুরী, ভূপেশ মুখার্জি, এ. ডবলু. মাহমুদ ইত্যাদি লব্ধপ্রতিষ্ঠ অধ্যাপকরা। ইংরেজি পড়াতেন প্রবাদপ্রতিম অধ্যাপক তারকনাথ সেন, সুবোধ সেনগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপকরা। অর্থনীতি পড়াতেন তাপস মজুমদার, ধীরেশ ভট্টাচার্য ইত্যাদিরা। প্রেসিডেন্সি তখন বিদ্যাদানে এশিয়ার অগ্রগণ্য সংস্থা। বরুণ দে'র সহপাঠী ছিলেন পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক বিনয়ভূষণ চৌধুরী। অর্থনীতিতে পড়তেন সুখময় চক্রবর্তী, অমর্ত্য সেন ইত্যাদিরা। এটা অনেকের কাছে আশ্চর্য লাগে যে আই. এ. এস. পরীক্ষা না দিয়ে বরুণ দে অ্যাকাডেমিক পথ বেছে নিয়েছিলেন। বরুণ দে'র পরিবার ছিল ব্রাহ্ম ও তাদের যোগাযোগ ভালো ছিল যাকে বলে কর্পোরেট মহলে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর প্রায় চারগুণ মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে। পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে উদ্বাস্তু এসেছে। ফলে আগে কলেজে যত সহজে কাজ পাওয়া যেত ১৯৫৩ সাল নাগাদ সেটা পাওয়া শক্ত হয়ে পড়েছে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বি.এ. অনার্স পাশ করে বরুণ দে অক্সফোর্ড-এ সেন্ট ক্যাথারিন সোসাইটিতে (পরে কলেজ নাম যোগ হয়) বি.এ.-তে ভর্তি হয়ে পাশ করেন, এম. এ. পাশ করেন সম্ভবত ১৯৫৭ সালে। ওই বছরের শেষ দিকে উনি কলকাতায় এলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে আংশিক সময়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, অধ্যাপক নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ'র অবর্তমানে। তিনি তখন লম্বা ছুটি নিয়ে মাদ্রাজে গিয়েছিলেন।

*প্রফেসর (অব.), ইসলামিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভূতপূর্ব সাধারণ সভাপতি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস।
e-mail : aruray@bsnl.in

প্রবন্ধ

আমাদের পূর্বসূরী ইতিহাস-সাধক: বেণীমাধব বড়ুয়া

গৌতম নিয়োগী*

(প্রাপ্ত. ২২মে ২০১৩খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

আমাদের দেশে অতীতে যাঁরা ইতিহাসচর্চার জগতে খ্যাতিমান এবং শ্রদ্ধার আসনে আসীন তাদের একে একে পরিচয় করিয়ে দেওয়াই বর্তমান প্রবন্ধমালার উদ্দেশ্য। প্রবন্ধমালার সূচনা বিশিষ্ট বাঙালি বৌদ্ধ ঐতিহাসিক বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮)। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, বৌদ্ধধর্ম, বৌদ্ধদর্শন, লিপিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে সুপণ্ডিত বেণীমাধব লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ. ডি.। সংস্কৃত, গণিত এবং ইংরেজি ভাষায় ব্যুৎপন্ন, সুলেখক। আজীবন তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন।

সূচকশব্দ

পালি, বৌদ্ধদর্শন, লিপিবিদ্যা, বৌদ্ধধর্ম, অশোক, ভারহূত, উদয়গিরি-খণ্ডগিরি, পালিবিভাগ, বৌদ্ধদর্শন

জীবন-কথা :

ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডাই ইন্ হারনেস', তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রফেসর এবং বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মাত্র ৫৯ বৎসর ৩ মাস বয়সে অকালপ্রয়াণ। আচার্য বেণীমাধবের কৃতিত্বময় ও ঘটনাবহুল জীবনকথা এবং বিপুল রচনাসম্ভারের সম্যক পরিচিতি ও মূল্যায়ন এক প্রবন্ধের পরিসরে সম্ভব নয়। তাঁর বহুমুখী স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল প্রতিভার পরিচয় তুলে ধরতে বই লেখা প্রয়োজন।

অবিভক্ত বঙ্গদেশের চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত মহামনি পাহাড়তলী গ্রামে এক মধ্যবিত্ত বাঙালি বৌদ্ধ পরিবারে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ ডিসেম্বর বেণীমাধব বড়ুয়া জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজচন্দ্র তালুকদার, মায়ের নাম ধনেশ্বরী দেবী। বেণীমাধব বাল্য বয়সেই স্কুলে ভর্তির সময় বংশের পদবি 'তালুকদার' পরিবর্তন করে 'বড়ুয়া' পদবি গ্রহণ করেন। তিনি পিতামাতার চতুর্থ সন্তান, পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ। পিতা পেশায় ছিলেন কবিরাজ।

---

*প্রাক্তন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, রাজা প্যারীমোহন কলেজ, উত্তরপাড়া, হুগলী।

email : goutamneogi1947@gmail.com

রাজধর্ম ও লোকধর্ম একটি স্থানীয় সমীক্ষা

মধুপর্ণা রায়চৌধুরী (কুমার)

(প্রাপ্ত ২২ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

উত্তর-উড়িষ্যার আরণ্যক অঞ্চল ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এর দেবী কীচকেশ্বরী, ভঞ্জ রাজাদের কুলদেবী হিসেবে স্বীকৃত। আদি-মধ্য যুগে যখন এই অঞ্চলটি খীজ্জিঙ্গকোটা নামে পরিচিত ছিল, তখন সম্ভবত মন্দিরের চামুণ্ডা মূর্তি খীজ্জিঙ্গেশ্বরী নামে পরিচিত ছিল। নবম থেকে একাদশ শতকের এই মধ্যবর্তী সময়ে ভঞ্জ রাজবংশ যখন এই আরণ্যক অঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে তাদের রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন এই লৌকিক দেবী ভঞ্জ কুলেশ্বরীর মর্যাদা পেয়েছিল। ধর্মীয় আনুগত্য কীভাবে আদি-মধ্যযুগে রাজা-প্রজা সম্পর্কে একটি অনুঘটকের কাজ করত, এই নিবন্ধে একটি আঞ্চলিক রাজবংশের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে তা দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান এবং লোকগাথা ব্যবহার করে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।

সূচকশব্দ

কীচকেশ্বরী, খীজ্জিঙ্গকোটা, খিন্দলীসন্তল, বামণঘাটি তাম্রশাসন, গণদণ্ড বীরভদ্র, খাণ্ডিয়া দেউল, বাথুরি, বুড়া জগন্নাথ, রাজকুলী ভুঁইয়া, রমাপ্রসাদ চন্দ।

উত্তর উড়িষ্যার আরণ্যক অঞ্চল ময়ূরভঞ্জের খিচিং-এ রয়েছে দেবী কীচকেশ্বরীর মন্দির। খুব বড় মাপের তীর্থক্ষেত্র না হলেও কীচকেশ্বরী এই অঞ্চলের একটি গুরুত্বপূর্ণ দেবীস্থান। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মন্দিরটিকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মীয় আদর্শ ও লৌকিক ধর্মচর্যার সেতুবন্ধনের প্রতীক বলা যায়। এই সমন্বয়ের অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছিল এই অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনজাতি এবং আঞ্চলিক রাজবংশের মধ্যে একটি রাজনৈতিক সহাবস্থান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণ ভারতবর্ষের আদি-মধ্যযুগে সংঘঠিত এই বিশেষ সমন্বয়ের তথা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে উপজাতীয় সংস্কৃতির ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাঙ্গীকরণ প্রক্রিয়াকে রাষ্ট্রব্যবস্থা উত্থানের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।[১] বর্তমানে এই মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কীচকেশ্বরী হিসেবে পূজিত হলেও, একসময়ে এটি খীজ্জিঙ্গেশ্বরীর মন্দির হিসেবেই পরিচিত ছিল। মন্দিরটির পরিচিতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ঠিক কবে ঘটেছিল

---

*এ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসর, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
email : madhuparna24@gmail.com

মধ্যযুগে বাঙালি মুসলিম মানসে হজরত আবুবকর সিদ্দিকির ভাবমূর্তি

শংকরকুমার বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি., সংশোধিত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

চিরায়ত ইসলামে হজরত মহম্মদের পাশাপাশি প্রথম খলিফা হজরত আবুবকরের সর্বস্তরের মান্যতা ছিল। ত্রয়োদশ - চতুর্দশ শতক থেকে ইসলামীয় বাংলা শাস্ত্র ও শাস্ত্র- বহির্ভূত সাহিত্যে হজরত আবুবকরের ভাবমূর্তি নির্মাণের প্রচেষ্টা দেখা যায়। উচ্চবর্গীয় সমাজের উপযোগী সাহিত্যের পাশাপাশি লোকায়ত ইসলামি সাহিত্যের আধারেও প্রথম খলিফার ভাবমূর্তি নির্মাণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে। এই ভাবমূর্তি নির্মাণ প্রচেষ্টা এ দেশের ইসলামিকরণ প্রক্রিয়াকেও সহায়তা করেছিল। বাংলা ভাষা হয়ে উঠেছিল এই প্রক্রিয়ার প্রধান মাধ্যম—যা বাঙালি মুসলিম সমাজে উম্মাহ (Ummah)-এর গঠনকে ত্বরান্বিত করেছিল।

সূচকশব্দ

আওয়াম, শাস্ত্রীয় ইসলাম, লৌকিক ইসলাম, শরা ও বেশরা, ইসলামি বাংলা সাহিত্যের লেখক, লিপিকর ও পাঠক, ছহি (সংশোধিত পাঠ), সাংস্কৃতিক অভিযোজন, শায়ের ও গায়েন, উম্মাহ্ (মুসলিম সম্প্রদায়)

তুর্কি বিজয়ের পূর্বেই বাংলাদেশ আরবীয় জগতের সংস্পর্শে আসে। আরবীয় বণিক ও সে দেশের ধর্মপ্রচারকরা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তবে ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে, বিশেষত বাংলাদেশের স্বাধীন সুলতানদের আমলে (১৩৫০-১৫৭৫) এদেশে ইসলামীয় সংস্কৃতির পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। তাদের উদারতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় ইসলামের বিজাতীয় ভাবধারার ধারণার ক্রমশ অপসারণ ঘটে। বাংলাদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে জাতিগত, ভাবগত ও সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাংলা সংস্কৃতি চর্চায় সংস্কৃতের স্থান নেয় বাংলা ভাষা। ষোড়শ শতক অর্থাৎ মুঘল আমল থেকে সাময়িক কালের জন্য হলেও এই সাংস্কৃতিক সৌহার্দ্যের পরিবেশে ছেদ পড়ে। এই পর্যায়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র গৌড়ের পরিবর্তে বাংলার সীমান্ত আরাকান রাজদরবারে স্থানান্তরিত হয়। চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্র।[১] এক্ষেত্রে ইসলামীয় বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন অভিজাত

---

*অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, মালদা উইমেন্স কলেজ, মালদা।
e-mail : skbiswashist@gmail.com

গোস্বামিনী জাহ্নবা : নারী-ক্ষমতায়নের ‘শুকতারা’

সনৎকুমার নস্কর*

(প্রাপ্ত ২৭ জুলাই ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

গোটা মধ্যযুগ জুড়ে বলশালী পুরুষতন্ত্রের দাপটে নারীরা ছিল কোণঠাসা। পুরুষের ভোগ্য ও ব্যবহার্য সামগ্রী করে তোলার জন্য আর্যসভ্যতার উষালগ্ন থেকেই হিন্দুর শাস্ত্রে-পুরাণে, স্মৃতি-সংহিতায় বানানো হয়েছিল দাসীর দর্শন। নারীকে সমস্ত দিক থেকে হেয় করে রাখার জন্য, সর্বোপরি ক্ষমতার অলিন্দ থেকে বহিষ্কার করার জন্য এই দর্শনের ভূমিকা ছিল অনন্য। নারীত্বের সেই চরম অবমাননার দিনে চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব সমাজের অভ্যন্তর ভাগ থেকে উঠে এলেন এক অগ্রণী নারী, যিনি তাঁর সুকঠিন ব্যক্তিত্বে, প্রাতিস্বিক চিন্তায়, সাংগঠনিক দক্ষতায়, নিপুণ কর্মকুশলতায় ও অভাবিত সক্রিয়তায় ক্ষমতাশালী পুরুষের সমকক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ইনি চৈতন্য-পার্ষদ প্রভু নিত্যানন্দের দ্বিতীয়া পত্নী গোস্বামিনী জাহ্নবা। নিত্যানন্দের প্রয়াণের পর তিনিই ছিলেন খড়দহ শ্রীপাটের প্রধান কর্ত্রী। শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান থেকে শুরু করে বাইরে-দূরে নানা দেশভ্রমণ ও বৃন্দাবনের গোস্বামীদের সঙ্গে নিবিড় শাস্ত্রালোচনায় ছিল তাঁর অসম্ভব পারদর্শিতা। খেতুরির মহোৎসবে নিয়েছিলেন এক অসামান্য নেত্রীর ভূমিকা। ষোড়শ শতকে নারীজাগৃতির সেই উষালগ্নে জাহ্নবার এই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সমাজের সকল স্তরকে বিস্মিত করেছিল। তিনি যুগান্তরের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলে পুরুষসুলভ দার্ঢ্যে ও স্থির প্রজ্ঞায় চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছিলেন। গৃহবন্দিনী নারীদের অন্ধকার জীবনের নিরিখে সে ছিল এক নতুন দিনের আভাস। রাত্রিশেষের পুব আকাশের ক্ষীণদীপ্তি শুকতারার মতো, তাঁর আকস্মিক উত্থানের মধ্য দিয়ে সূচিত হয়েছিল বাঙালি নারীর ক্ষমতায়নের আনন্দময় সুপ্রভাত। সেই মহীয়সী নারীর প্রতি এ এক দীন সারস্বত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

সূচকশব্দ

পুরুষতন্ত্র, দাসীর দর্শন, লিঙ্গ-রাজনীতি, সামাজিক দ্বিমেরুত্ব, আত্মশক্তি, ক্ষমতায়ন, স্বাধীনতার মুক্তাঙ্গন, নারীর স্বশক্তিকরণ, নারীমন্ত্র, নারীজাগৃতি।

সে ছিল তখন ইতিহাসের এক আলো-আঁধারি সময়, যাকে বলে যুগসন্ধির কাল। হিন্দুরাজারা বিদায় নিয়েছেন প্রশাসনিক দায়িত্ব থেকে, শুরু হয়েছে ইসলামি শাসনের যুগ। সুতরাং আগেকার পরিস্থিতি অনেকটাই পরিবর্তিত। সুলতানের অধীনে হিন্দু সমাজ তখন যাপন করছে এক অস্থিরতাময় জীবন।[১] সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ভূমিজীবী মানুষের তখন নাজেহাল দশা। গোটা দেশের যেন নাভিশ্বাস উঠেছে। রাজশক্তি খোয়ানো উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ভিতরে ভিতরে আতঙ্কিত। যেকোনো সময়েই প্রাণ যেতে পারে, বলদর্পী শাসক কেড়ে নিতে পারে

*প্রফেসর, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
e-mail : sknbeng.cu@gmail.com

অষ্টাদশ শতকে ভারতের রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং অর্থনীতির রূপরেখা : একটি বিতর্ক

বিনয়ভূষণ চৌধুরী*

(প্রাপ্ত ১ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক অতীতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ও তার প্রভাবে অষ্টাদশ শতকের ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থা ও অর্থনীতি—এই দুই বিষয়ে নানা মত দেখা যাচ্ছে। দীর্ঘকাল ধরে যে ধারণা ছিল— যেমন, মুঘলদের পতনের মাধ্যমে ভারতীয় ব্যবস্থা সমূহে বিপর্যয় নেমে আসে, তা আধুনিক কিছু গবেষণায় খণ্ডিত হচ্ছে। নূতনভাবে যাঁরা বিশ্লেষণ করছেন তাঁদের সংস্কারবাদী ঐতিহাসিক বলা হয়। তাঁদের মতে মুঘল সাম্রাজ্যে কোনো রাষ্ট্র সেভাবে গড়ে তোলেনি কারণ সম্রাট ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধস্তন শাসকদের রাজা মাত্র। ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত রাজ্যগুলির অস্তিত্ব ছিলই, প্রায় সেই সঙ্গে ছিল তাদের আঞ্চলিক অর্থব্যবস্থা। মুঘল সম্রাট কেবলমাত্র স্থানীয় ফৌজদারদের নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং আঞ্চলিক ক্ষমতার কেন্দ্রগুলির আনুগত্যলাভ করতে চাইতেন। ফলে ঐ ঢিলেঢালা ব্যবস্থা মুঘলদের পতন ঘটলেও বিপর্যস্ত হয়নি। বিশেষ করে ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ থেকে সোনা-রূপোর নিয়মিত জোগান বজায় থাকায় মুদ্রাব্যবস্থা যেমন ভাল ছিল তেমনি সচল ছিল বাণিজ্য। এই কাঠামোকে মুঘল প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। ফলে তাদের পতন ঘটলেও ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই কাঠামোর অংশীদারদের সঙ্গে এক সমঝোতা করে নেয়। এভাবে অর্থনীতিতে বিপর্যয়কে রোধ করাও সম্ভব হয়েছিল বলে সংস্কারবাদীরা মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাঁদের এইসব বক্তব্য কতখানি গ্রহণ করা যাবে, সে বিষয়ে আমরা সন্দিহান কারণ ঐ সব ঐতিহাসিকরা বহু সময়ে নেহাতই অনুমান-নির্ভর কিছু সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

সূচকশব্দ

মুঘল, কেন্দ্রীভূত প্রশাসন, রাষ্ট্র, খণ্ডরাজ্য, সংস্কারবাদী, নগদ, রাজস্ব, অষ্টাদশ শতক, বাণিজ্য, কৃষি অর্থনীতি, অর্থনীতি, জায়গির, রাজনীতি।

---

*প্রফেসর (অব.) ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং প্রাক্তন সাধারণ সভাপতি, ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেস।
e-mail : bbchaudhuri@gmail.com

লেখকের পূর্ব প্রকাশিত প্রবন্ধ : 'Characterizing the polity and economy of late pre-colonial India : The Revisionist Position in the debate over the eighteenth century in Indian History.'
(The Calcutta Historical Journal, Vol. XIX and XX, 1997-98) -র অনুবাদ। (স.)
অনুবাদ : সৌমিত্র শ্রীমানী ও তৃপ্তি চৌধুরী

দার্শনিক তথা মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি ও 'গোরা'

মৃগাঙ্ক মুখোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত ৭ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি., সংশোধিত ২১ অক্টোবর ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে সার্বিক ভাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সর্বজনীন মানবতাবাদী দর্শনকে তুলে ধরার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। 'গোরা' উপন্যাসটি এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় এবং তাকে ঘিরে জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিষয়গুলিও উঠে এসেছে। এর পাশাপাশি উপন্যসের মূল চরিত্র গোরার, এক উগ্র হিন্দুত্ববাদী দেশপ্রেমিক যুবক থেকে সত্যসন্ধানী বিশ্বমানবে উত্তরণের বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে।

সূচকশব্দ

সর্বজনীন, বিশ্বজনীন, ব্রাহ্ম, শাশ্বত, বিশ্বমানব, Nationlism, স্বদেশি আন্দোলন, ১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ, আন্তর্জাতিকতা, ধর্ম, দেশপ্রেম, নারীমুক্তি, নারী স্বাধীনতা,প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি, সাম্রাজ্যবাদ, বিশ্বযুদ্ধ,মানবতাবাদী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত *গোরা* একটি অন্যতম জটিল রাজনৈতিক এবং সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, দেশ এবং সর্বোপরি মানব চরিত্রের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাকে তুলে ধরা হয়েছে। তাই এক দিকে দেখতে গেলে, এই উপন্যাসটি একজন মানুষের মনস্তত্ত্বকে প্রকাশ করে এবং তার মাধ্যমে স্বয়ং ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বজনীন দর্শন ও তাঁর সার্বজনীন ভাবনাকে আমাদের বুঝতে সাহায্য করে।

গোরা উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয়, ধারাবাহিক ভাবে, *প্রবাসী* পত্রিকায় ভাদ্র, ১৩১৪ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি তারিখ আগস্ট-সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ফাল্গুন, ১৩১৬ বঙ্গাব্দ (ইংরেজি ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ) এর মধ্যে। এর পরের বছরে (ইংরেজি ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে) কিছু পরিবর্তনসহ গ্রন্থ আকারে উপন্যাসটি মুদ্রিত হয়। গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত সংস্করণটিতে পত্রিকায় প্রকাশিত বেশ কিছু অংশ বাদ দেওয়া হয়।

উপন্যাসটির রচনাকাল স্বদেশি আন্দোলনের সমসাময়িক হলেও, এই রচনাটির পটভূমি ১৮৭০-এর দশকের কলকাতা শহর। এখানে বলে রাখা দরকার, এই সময়েই ভারতবর্ষে

স্নাতকোত্তর দ্বিতীয় বর্ষ, ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : mrigankamukhopadhyay@gmail.com

গোয়েন্দা নথিতে ১৯০৮ সালের মেদিনীপুর বোমা মামলায় নাড়াজোল রাজ

মঙ্গলকুমার নায়ক*

(প্রাপ্ত ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৩খ্রি., সংশোধিত ১ জুন, ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

বিশ শতকের প্রথম দশকে বাংলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে বাঙালি সমাজের সর্বস্তরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তরঙ্গ তৈরি হয়। এই সময়ের আন্দোলনে মেদিনীপুর জেলা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। জমিদার, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, ব্যবসায়ী থেকে সাধারণ মানুষ সবাই কম বেশি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। জনতার সংগ্রামী চেতনাকে বিভক্ত করতে ১৯০৮ সালে ইংরেজ সরকার 'মেদিনীপুর বোমা মামলা' নামে একটি মিথ্যা মামলা চালু করে বাংলা বিভাজন-বিরোধী আন্দোলনকে দমন করতে চেয়েছিল। এই আন্দোলনে মেদিনীপুরের নাড়াজোলের 'রাজা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। জেলে আটক করে, রাজা উপাধি কেড়ে নিয়ে, মিথ্যা মামলা দিয়ে রাজার সামাজিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা হলেও ঐ পর্বের আন্দোলন থেকে রাজাকে সরানো যায়নি। তদানীন্তন বাংলা সরকারের গোয়েন্দা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের ভিত্তিতে 'মেদিনীপুর বোমা মামলা'য় নাড়াজোলের রাজার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অপ্রকাশিত রাজনৈতিক ঘটনাবলি এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হল।

সূচকশব্দ

মেদিনীপুর, রাজা, জমিদার, নাড়াজোল, বোমা ষড়যন্ত্র মামলা, গ্রেপ্তার, পত্তনিদার, স্বদেশি চাঁদা, গোয়েন্দা বিভাগ, আর্থিক সাহায্য, সশস্ত্র, চিঠি, দোষ স্বীকার।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে শত সহস্র প্রাণের আহুতিতে উত্তাল হয়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ভারতবর্ষ, ইতিহাসের পাতায় যার নাম অগ্নিযুগ। এই যুগে যৌবন অতিক্রম করেছিল মৃত্যুভয় । দৃপ্ত বক্ষে গ্রথিত হয়েছিল যুগান্তরের স্বপ্ন। এই যুগের প্রথম দশকে বাংলা বিভাজনকে কেন্দ্র করে সারা দেশ জুড়ে জাতীয়তাবাদের উত্তাল তরঙ্গ তৈরি হয়। এই তরঙ্গে অবিভক্ত মেদিনীপুর জেলা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। শতকের শুরু থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত সময় জুড়ে বার বার এই জেলা সংবাদের শিরোনামে এসেছে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয় তা গোড়া থেকেই এখানে সশস্ত্র

গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

email. nayakhistory2011@gmail.com

ইতিহাসের আলোয় চা-বাগানের নামকরণ : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ

সুপম বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত ১৭ আগস্ট ২০১৩ খ্রি., মানোন্নীত ১২ সেপ্টেম্বর ২০১৩ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ঔপনিবেশিক পর্বে উত্তরবঙ্গে বিশেষত দার্জিলিং জেলার পাহাড় ও তরাইয়ে এবং জলপাইগুড়ি জেলার ডুয়ার্সে গড়ে ওঠা চা-বাগিচাগুলির নামকরণের পশ্চাতে একটি ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে। উনবিংশ শতকের শেষার্ধে ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাঙালি উদ্যোগপতিগণ ইউরোপীয় চা-করদের সাথে পাল্লা দিয়ে সুন্দর চা বাগান গড়ে তোলেন। এই চা-বাগানগুলি স্থাপনের সময় তাঁরা হয় নিজেদের নামে নতুবা তাঁদের পরিবারের মেয়ে, স্ত্রীদের নামে আবার কখনো নিজের প্রিয় বন্ধু বা অবিভক্ত বাংলাদেশে ছেড়ে আসা প্রিয় গ্রামের নামানুসারে চা-বাগানটিরও অনুরূপ নামকরণ করেন। যেমন— কমলপুর, শচীনচন্দ্র, সতীশচন্দ্র, সাহাবাদ, কমলা, সোনালী রুপালী, গোপালপুর, দিয়াবাড়ি প্রভৃতি। তবে সিংহভাগ চা বাগানেরই নামকরণ হয়েছে স্থানীয় নদী বা ঝোরার নামানুসারে যেমন— ডায়না, মালনদী, নিমতিঝোরা, দেবীঝোরা, মাঝেরডাবরি প্রমুখ। আবার কোথাও চা-বাগানের নামকরণের ক্ষেত্রে ওই এলাকার কৃষি, ঐতিহাসিক ঘটনা এবং সর্বোপরি মানুষের ভক্তি ও আবেগ জড়িয়ে রয়েছে। যেমন— মকাইবাড়ি, আলুবাড়ি, সন্ন্যাসীস্থান, রাধারানি, রাজাভাতখাওয়া, গৌরনিতাই প্রভৃতি। সর্বোপরি চা-বাগিচার নামকরণের ইতিহাসচর্চার মাধ্যমে ওই এলাকার স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল, জনতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

সূচকশব্দ

চা, চা-বাগান, টি-এস্টেট, চা-কর, ঝোরা, তরাই, ডুয়ার্স, পাহাড়ী নদী, টপোনমি।

স্থাননাম চর্চা যাকে বলা হয় Toponomy তার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে কোনো মহলেরই দ্বিমত নেই। কোনো স্থানের বহু কিছুই কালের নিয়মে অবলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু স্থাননামের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় ইতিহাস তথা সংস্কৃতির অমূল্য সব উপাদান। ভাষাচার্য সুকুমার সেন তাঁর *বাংলা স্থাননাম* গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক থেকে বাংলাদেশের স্থাননামের মধ্যে যে ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায় তা বাংলার ইতিহাসের অনেক অলিখিত তথ্যকে প্রকাশ করে।

*পি-এইচ. ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।
email : sntul biswas@gmail.com

দেশ-বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গ : ন্যায়নীতি বনাম রাজনীতি

রতনলাল চক্রবর্তী*

(প্রাপ্ত : ২৭ মে ২০১৩খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে দেশ-বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার বিদ্যালয়ের ইতিহাস পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জটিলতা ও প্রণীত পাঠ্যপুস্তক প্রসঙ্গে ভারতের মন্ত্রীর বিভিন্ন আপত্তির প্রসঙ্গ। পাঠ্যসূচি প্রণয়নের পূর্বেই সরকারিভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যেহেতু ইসলাম ধর্মের আদর্শের ভিত্তিতে পাকিস্তান জন্মলাভ করে, সেজন্য শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্র ইসলাম ধর্মের আদর্শের প্রতিফলন অত্যাবশ্যকীয়। বলাবাহুল্য এই উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে একমাত্র ধর্ম ব্যতীত আর কোনো মিল বা বন্ধন ছিল না। ফলে পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার প্রশ্নে একমাত্র উপায় হল ইসলাম ধর্মের আদর্শের সম্পূর্ণ প্রতিফলন এবং এক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই সরকারিভাবে পূর্ব বাংলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পূর্ব বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিচালিত হয় ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া। পূর্ব বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে বিদ্যালয়সমূহে নিত্যদিনের সমবেত সমাবেশ, ছাত্রদের বাধ্যতামূলক নামাজ পড়া, বিদ্যালয়ের ইতিহাসসহ অন্যান্য বিষয়ের পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে আপ্রাণভাবে ইসলামিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই প্রবন্ধে কেবলমাত্র পূর্ব বাংলার বিদ্যালয়সমূহের জন্য ইতিহাস পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জটিলতা ও প্রণীত পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে ভারতের একজন মন্ত্রীর আপত্তির বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইতিহাস পাঠ্যসূচি প্রণয়নের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব ইসলামের তথা মুসলিমদের ইতিহাসের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করা হলেও কোনো কোনো স্থানে বৃহত্তর তথা অবিভক্ত ভারতের ইতিহাসের বিষয়টি চলে এসেছে। এই ভাবে রচিত ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকসমূহে উপস্থাপিত বিষয়ে তথ্য বিভ্রান্তি, বিকৃতি এবং সর্বোপরি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে অবজ্ঞাপূর্ণ মন্তব্য করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ সকলের মূলে ছিল পাকিস্তানের রাজনীতি। ইতিহাস পাঠ্যপুস্তকসমূহ সম্পর্কে ভারতের মন্ত্রীর বিভিন্ন আপত্তির প্রসঙ্গ পাকিস্তান কর্তৃপক্ষকে এক জটিল ও বিব্রতকর বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। ভারতের মন্ত্রীর বিভিন্ন আপত্তির পশ্চাতে ছিল ন্যায়-নীতি, কিন্তু পাকিস্তান সরকার ব্যস্ত ছিল বিষয়টির রাজনীতি নিয়ে।

---

*প্রফেসর (অব.) ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ।
email : ratanlalchakraborty@yahoo.co.in

গ্রন্থ সমালোচনা

মধ্যযুগের ভারতে প্রশাসন ও তার ভাষা

সৌমিত্র শ্রীমানী*

মধ্যযুগের পৃথিবীতে রাষ্ট্রতত্ত্ব এবং রাষ্ট্রশাসনযন্ত্র—এই দুই বিষয়ের চরিত্র নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছিল। এই সব আলোচনাগুলির মূল আদর্শগত ভিত্তি অবশ্যই ছিল ধর্ম। রাষ্ট্রধর্ম এবং ধর্মের রাষ্ট্র—কোনটাকে গ্রহণ করা হবে—এসব প্রশ্নে মতবিভেদ ছিল তীব্র। ষোড়শ শতকে ইউরোপে আবার একই ধর্মীয় ব্যাকরণের দুই বা ততোধিক শাখায় যেসব মত সৃষ্টি হয়েছিল, তাদের প্রয়োগক্ষেত্রে এতই বৈপরীত্য দেখা গেল যে, প্রবল রক্তপাতেও তাদের পুরো মীমাংসা করা কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে। একই রকমের সংকট এশিয়া ভূখণ্ডেও দেখা যায়। ত্রয়োদশ শতক থেকেই এশিয়ার বিশাল এলাকায় ইসলামের প্রভুত্ব কায়েম হতে শুরু করে যা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত একটানা বজায় ছিল। লক্ষণীয় বিষয় যে, ইউরোপের রাষ্ট্রব্যবস্থা সংক্রান্ত মতবাদগুলির মতো এশিয়াতে বৈপরীত্য ছিল অপেক্ষাকৃত কম।

এশিয়ার তৎকালীন রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে সবার আগে ভারতের কথাই মনে আসে। মধ্যযুগের ভারত এমনই এক ভূখণ্ড যেখানে দীর্ঘ ছয় শতাব্দী মুষ্টিমেয় বিধর্মীরা শাসন করেছিল বিপুল সংখ্যক ভূমিপুত্রদের ওপর। অবশ্য ত্রয়োদশ শতকের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সপ্তদশ শতকের শাসকদের প্রকৃতিগত মিল ছিল সামান্যই। তবে শাসকদের চরিত্রের মধ্যে পার্থক্য বিশেষ ছিল না। যে ভারতকে মুসলমান শাসকগোষ্ঠী শাসন করেছিল, সেই ভারতের নিজস্ব সভ্যতা ও সংস্কৃতি ছিল বহু প্রাচীন। এবং সেই সংস্কৃতির জঠর থেকেই জন্ম নিয়েছিল বহুত্ববাদ। বহুত্ববাদের মধ্যে যেমন বাহ্যিক উদারতা যথেষ্ট তেমনি তার সমস্যাও কম নয়। সমস্যা ছিল বহুত্ববাদকে লালন করার। সেই সমস্যাকে কীভাবে মীমাংসা করা হল, তার এক মনোগ্রাহী রূপ পাওয়া যায় আলোচ্য বইটিতে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে এইচ.এ.আর. গিব তাঁর *Studies on the Civilization of Islam* বইতে প্রমাণ করেছিলেন যে, যেসব অঞ্চল ইসলাম জয় করেছিল সেইসব স্থানে সে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলিকে বজায় রাখতে সমর্থ হয়! ফলে শাসক ইসলাম ও শাসিত বিধর্মীর মধ্যে এক সমন্বয় পরোক্ষভাবে সাধিত হতে পারে। যদিও ইসলামের রাষ্ট্র তার *শরিয়ৎ* মেনে শাসিত হচ্ছিল তথাপি, *শরিয়ৎ*-এর বাইরেও এক নতুন রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্ম হয় যা তার নিজ আঞ্চলিক আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সম্মান করত। ফলে ইসলামের আদর্শগত ভিত্তি বহুলাংশে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে যায়।

*অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, পি. এন. দাস কলেজ।
e-mail : itikotha@gmail.com